Extension Service Department

David Hare Training College, Calcutta-19

A Symposium on Rabindranath, his educational philosophy & his poetry.

রবীন্দ্রনাথ ঃ তাঁর শিক্ষা ও কাব্য

ঃ বক্তা ঃ

ডক্টর শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র।

শ্রীঅমিয় কুমার সেন।

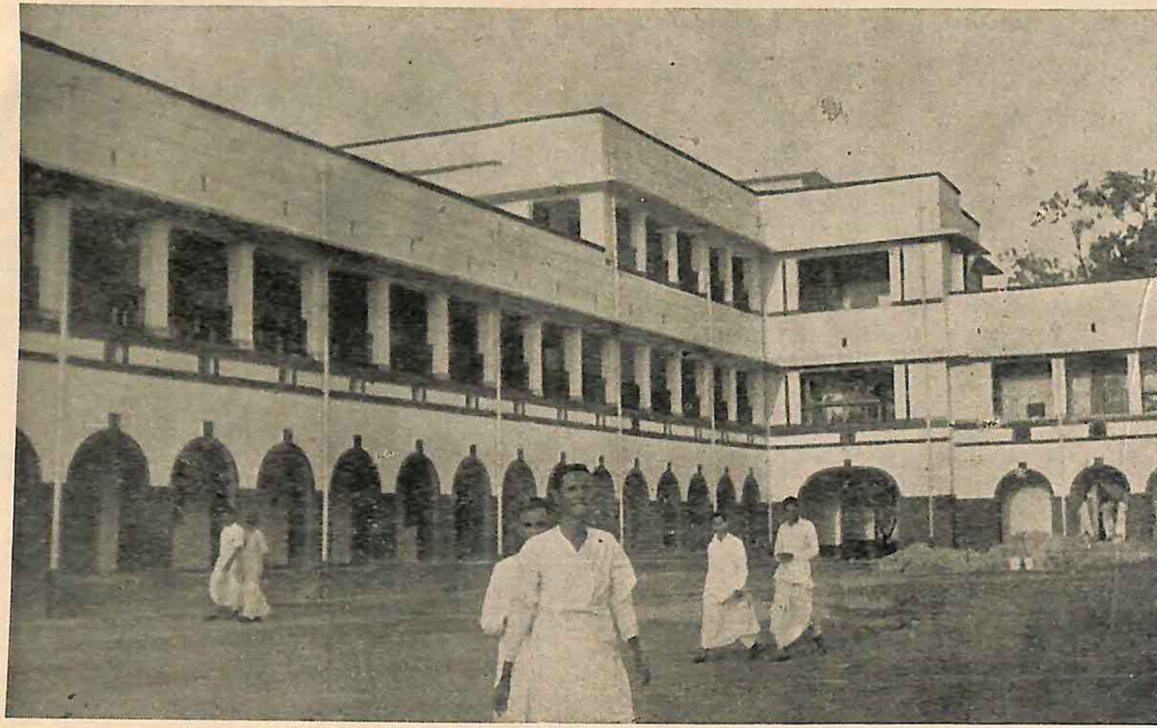
শ্রীকুলদা প্রসাদ চৌধুরী।

শ্রীসুখময় সরকার।

"একস্‌টেনশন সার্ভিস্‌ ডিপার্টমেণ্ট ;
ডেভিড্‌ হেয়ার ট্রেণিং কলেজ"

২৫।৩, বালীগঞ্জ সর্কুলার রোড, কলিঃ—১৯

জানুয়ারী ১৯৬২



Extension Service Department, David Hare Training College.

আলোচনা চক্র : বিষয় রবীন্দ্রনাথ

জানুয়ারী, ১৯৬২

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অন্তর্ভুক্ত একসটেনসন-সার্ভিস ডিপার্টমেণ্ট রবীন্দ্রনাথের উপর একটি আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেন। অধিবেশন বসেছিল, ৮ই জানুয়ারী সোমবার বেলা ১ ঘটিকায়। বালীগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের হলঘরে। কলেজ বার্ষিক ও পুনর্মিলন উৎসবের অন্তবর্তীকালে। বহু কলেজের এবং ইস্কুলের অধ্যাপক ও শিক্ষকেরা ছিলেন শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে। সমস্ত হলঘরটি ভরতি ছিল; সবাই মুগ্ধচিত্তে এই আলোচনা শোনেন।

বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীসুখময় সরকার, শ্রীকুলদাপ্রসাদ চৌধুরী, শ্রীঅমিয়কুমার সেন এবং ডক্টর শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র।

কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করে বলেন, "গতবছর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় 'ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করে যান। তাঁর আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমরা বহু বিষয় জানতে পেরেছি। এ বছরে এই আলোচনাচক্রে আমরা এমন বক্তাদের পেয়েছি যাঁরা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিষয়ে এবং কাব্য প্রসঙ্গে বিশেষ পরিচয় রাখেন। শ্রীযুক্ত অমিয় সেন বহুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। সেখানকার নানা কার্যে তিনি জড়িত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ভাবধারা সম্পর্কে তিনি তাই বিশেষ পরিচয় রাখেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে স্বল্প মূল্যে যে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী প্রচারিত হয়েছে, তিনি সেই কর্মপরিষদের একজন অন্যতম সদস্য। বর্তমানে তিনি অত্যন্ত কর্মব্যস্ত লোক। তবু যে তিনি একটু সময় করে আমাদের এই আলোচনাচক্রে যোগদান করেছেন, এজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক। তাঁকে আমরা পূর্বেও পেয়েছি। তাঁর মধ্যে হৃদয় এবং বুদ্ধির এমন চমৎকার সংমিশ্রণ আছে যে, তাঁর আলোচনায় যে কেউ স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এবারেও তাঁকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা ধন্য।

শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ চৌধুরী বর্তমানে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান গবেষণা বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে আছেন। কিন্তু পূর্বে তিনি শান্তিনিকেতনের বিনয়ভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন। সেখানকার বি-টি সিলেবাস তিনিই প্রণয়ন করেন। কাজেই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্পর্কে বলবার মত তিনি একজন বিশেষ ব্যক্তি।

শ্রীযুক্ত সুখময় সরকার যদিও বর্তমানে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের ছাত্র তবু তিনি সাহিত্য বিভাগে অনেক কাজ কর্ম করেছেন। তাঁর কাছ থেকেও আমরা রবীন্দ্রনাথের কথা অনেক শুনতে পাব।"

এরপর চক্রের বক্তারা তাঁদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। সেগুলি এই পুস্তিকাতে দেওয়া হল।

পরিশেষে কলেজের অধ্যাপক শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় সকলের পক্ষ থেকে আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠাতা এবং বক্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, এইরূপ আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা আরও হলে শিক্ষক অধ্যাপকেরা বিশেষ উপকৃত হবেন।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা

শ্রীসুখময় সরকার

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার দিক সম্পর্কেই আমি বিশেষভাবে আলোচনা করব। কবি দেখেছিলেন, আমাদের দেশের শিক্ষা সমাজের সঙ্গে চলে নি। সে শিক্ষায় আমাদের হৃদয়ের বা জীবনের কোন যোগই নেই। তিনি দেখেছিলেন, সে শিক্ষা ঠিক দেশ থেকে উদ্ভূত হয়নি। বিদেশী শাসকেরা চাপিয়ে দিয়েছে, তা সে যে কোন কারণেই হোক। সে শিক্ষায় জীবিকা নির্বাহ হচ্ছিল বটে, কিন্তু মানুষ তৈরী হচ্ছিল না।

মানুষ তৈরী করতে হলে একটি আদর্শ শিক্ষা চাই। ভারতের প্রচীন তপোবনের আদর্শকেই তিনি এই শিক্ষার উপযোগী মনে করলেন। সেই তপোবনের আদর্শকেই তাই তিনি আমাদের শিক্ষায় গ্রহণ করলেন। এই আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষাকে রূপ দিতে গিয়েই তিনি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় স্থাপন করেন। উপনিষদের যে-শিক্ষা সেই শিক্ষা রূপকেই তিনি এই বিদ্যালয়ে স্থান দেন।

উপনিষদের বড় শিক্ষাই হল আনন্দ, সমস্ত জগৎ আনন্দেই বিধৃত, বিরাজিত। আনন্দ যেমন এ শিক্ষার গোড়াকার কথা, আবার আনন্দই এশিক্ষার শেষ কথা। এ শিক্ষার 'ব্যাপ্তি'র দিকও আছে। প্রকৃতির সান্নিধ্যে, প্রকৃতির মধ্য থেকে যে শিক্ষা সেই শিক্ষাই মানুষের মনকে মুক্ত করে। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষার পরিবর্তে শান্তিনিকেতনের রমনীয় স্থানে তাই তিনি তাঁর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নেবে মানুষ। কিন্তু কেমন ভাবে? প্রকৃতিকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে হবে, তাকে মায়ের আসনে বসাতে হবে। প্রকৃতিকে জয় করবার বাসনা নিয়ে গেলে তার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় না। এই প্রসঙ্গে ডিউয়ির শিক্ষাদর্শের কথা মনে

হয়। ডিউয়ির শিক্ষানীতি যদি অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে, তবে কবির শিক্ষানীতি আনন্দদ্বারা।

ইতিমধ্যে ঘটে গেল প্রথম মহাযুদ্ধ। এই মহাযুদ্ধের বীভৎস রূপ তিনি দেখলেন। দেখলেন মানুষে মানুষে অসম্প্রীতি। দেখলেন হিংসা আর বিদ্বেষের কুটিল নৃত্য। তিনি এই সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষানীতির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। তারপর শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর এল নূতন দৃষ্টিভঙ্গী।

শিক্ষায় মানুষে-মানুষে প্রীতির ভাবটিকে তিনি গ্রহণ করেন। এই বিশ্বপ্রীতির শিক্ষানিকেতনই হচ্ছে বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতী হয়ে উঠল আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়। আন্তর্জাতিকতার শিক্ষাক্ষেত্র। সেই মন্ত্রটি, "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।" দেওয়া-নেওয়ার ভাবটিকেই তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিধৃত করেন।

বর্ত্তমান ভারতে আবার ভেদাভেদ দেখা দিয়েছে। নানারকমের অসম্প্রীতি। যার জন্য দেশের নেতারা জাতীয় সংহতির কথা বারবার বলছেন। শিক্ষার মধ্য দিয়ে কি করে এই সংহতি সাধন করা যায় তার কথা বলছেন, ভাবছেন। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতি নিয়েই যিনিই আলোচনা করবেন তিনিই দেখতে পাবেন যে, কবি এই সম্প্রীতি সাধনের প্রকৃত শিক্ষাকল্পকে সুবিস্তৃতই বলে গেছেন। আজও শিক্ষাবিদেরা সেখান থেকে এ বিষয়ে নানা ধারণা পেতে পারেন।

শান্তিনিকেতনে তীর্থবাস

শ্রীকুলদা প্রসাদ চৌধুরী

শান্তিনিকেতনের বিনয়ভবনের অধ্যক্ষ হিসাবে দুই বছরের জন্য সেখানে আমার তীর্থবাস ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথকে কেন যে 'গুরুদেব' বা 'ঋষিকবি' বলা হয় তার প্রত্যক্ষ পরিচয়ই পেয়েছিলাম। শান্তি-নিকেতনের ভেতরে যা দেখতে পেয়েছিলাম সেই নীতি-ধর্মের উপর নির্ভর করেই বিনয়ভবনের সিলেবাস তৈরী করেছিলাম।

শিক্ষাক্ষেত্রে তিনটি মূল বিষয় আমরা পেয়ে থাকি। শিক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি। এই সব বিষয়ে দুটি প্রধান মতভেদ রয়েছে। তা হচ্ছে, Individualistic আর socialistic approach ; ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য আর সমাজ-বোধের দৃষ্টিভঙ্গী। গুরুদেব যে অনেকখানি individualistic বা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন তা তাঁর শিক্ষাকর্ম থেকে বেশ বোঝা যায়। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য। তাঁর যে কথা, প্রকৃতি আমাদের জ্ঞানদাত্রী হবেন, তা শান্তিনিকেতনের কর্মপদ্ধতিতে বেশ মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবি তাঁর রচনার মধ্যদিয়েও বারবার এই individualistic approach দেখিয়েছেন। সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, শিল্পকলা ইত্যাদি Extra-curricular activities এর মাধ্যমে আনন্দের মধ্য দিয়ে এখানে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় Liberal education এর রূপ। craft এর শিক্ষার মধ্যেও এই রূপটি পাই। এই craft শিক্ষা এখানকার শিক্ষার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ রূপে গণ্য করা হয়।

আবার ব্যক্তিগত ও সামাজিক শিক্ষার সমন্বয় ও তিনি করে গেছেন। অধ্যাপকপল্লী ও ছাত্রপল্লীর মধ্যে যে অপরূপ স্নেহ-ভক্তির সম্পর্ক দেখেছি তা কখনও বিস্মৃত হবার নয়। তিনি যে শিক্ষাপল্লী গঠন

করেছেন, এমন কি তাঁর World-mindedness ও তাঁর Individualistic thinking থেকেই এসেছে। আবার Sociological এবং Ideal educational thinking এর দিক দিয়েও তিনি অনেক কিছু করে গেছেন।

শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে যা দেখেছি তাতে পরস্পরের intellectual interaction এর মধ্য দিয়ে Sociological thinking এর মিশ্রণ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। তারই পরিণতি তো অধ্যাপক পল্লী। অধ্যাপক আর ছাত্র সমাজই শুধু নয়। এখানে অধ্যাপক, অধ্যাপকের পরিবার আর ছাত্র এই তিনের সহযোগ।

আর আছে সেখানকার কর্মপরিষদ। এই কর্মপরিষদ একটি বৈশিষ্ট্য। এই কর্মপরিষদের বড় ধর্ম হচ্ছে Status consciousness এখানে একেবারে নেই। একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সবাই একটি নূতন পরিবেশ বা সমাজ প্রবর্ত্তন করবে এই-ই এখানকার আদর্শ বা নীতি।

রবীন্দ্রনাথ যা চিন্তা করেছেন তাই-ই রূপ দিয়েছেন। কথা আর কাজের এমন সামঞ্জস্য এদেশে আর কোথাও আছে কিনা জানিনা। ভগবান আমাকে কার্য্যের মধ্য দিয়ে নানাদেশ দেখবার সুযোগ দিয়েছেন। অন্তত আমি তো কোথায়ও তা দেখিনি। সমাজ থেকে তিনি যেমন ছেলেদের দূরে নিয়ে এসেছেন তেমনি প্রত্যেক ছাত্রকে rural work করতে হত। কাজের সঙ্গে যোগ রেখেছেন শিক্ষার। তেমনি সমাজকেও তিনি ইস্কুলের মধ্যে এনে ফেলেছেন। এই জন্যই শ্রীনিকেতনের সৃষ্টি হল। পৌষ মেলার উৎসবও এই কারণে।

Craft এর কথা আগে বলেছি। এ বিষয়ে আর একটু বলবার এই যে, এখানে তিনি productive side থেকে creative দিকের উপরই জোর দিয়েছেন। এই দিকটি Basic education এ নেই।

Sociological view নিয়ে এইভাবে তিনি individualistic aspect কে ফুটিয়ে তুলেছেন। আরও আছে স্বাতন্ত্র্য পাঠভবনে। ছোটদের এই শিক্ষালয়ে ছেলেরা নিজদের discipline maintain করবে। আশ্চর্য্য এই, শিক্ষকদের সেখানে প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও ছেলেরাই সেসব সুচারু রূপে নির্বাহ করত।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কাব্যরচনা

ডক্টর শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

রবীন্দ্রনাথের কবিতার অপরিসীম বিস্তৃতি এবং বৈচিত্র্যই তাঁর কাব্য নিয়ে আলোচনা করবার একটা বাধা। আলোচনা করতে গেলে তাঁর কাব্যের বিশেষ কোন এক দিক নিয়েই সুরু করতে হয়।

তিনি প্রথম কবিতা রচনা আরম্ভ করেন বাল্যকালে। কবিতা রচনার প্রস্তুতি পর্ব কেটে গেছে ১৮৮০ থেকে ১৮৯০ এর মধ্যে। উত্তরজীবনে কবি হিসেবে তিনি যত কথা বলেছেন তার সারাংশ এবং সূচনা আমরা এই পর্বের মধ্যেই পাই। তিনি বাঁকুড়াতে এক সময় বলেছিলেন, 'আমার মরাইয়ের যত ফসল তার বীজ সুদূর অতীতে।' আত্মকথা তিনি যথেষ্ঠ এবং যথোচিত ভাবেই বলেছিলেন।

তাঁর কবিতার মূলকথাই কিন্তু কবিতার ধর্মের সমস্ত পরিচয় দেয় না। কবিতার প্রকাশনীতিও অনুধাবন করতে হবে। মূলকথার দিক দিয়ে তিনি হয়ত নতুন কিছু বলেননি। জগতের অনেক কবি এবং বড় বড় কাব্যে এইসব মূলকথাই বলেছেন বা বলা হয়েছে। তুলনা করতে হলে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ একটি বড় আকাশ, এখানে মানবের অনেক আলোর স্ফূর্তি ঘটেছে। সেই আলোর স্ফূর্তি দেখতে হলে রচনারীতি কথাটা ভাববার। তাঁর প্রথম পর্বে অনেক রকমের সংকেত পাই। তাঁর ভবিষ্যতের কবিতা কোন্ পথ গ্রহণ করবে তার সংকেত এখানেই পাই। ভবিষ্যতে তিনি গীতি-কবিতার পথটিই গ্রহণ করেছেন, মহাকাব্যের নয়। মহাকাব্য সম্পর্কে তাঁর অনেক কথা অনেকেই জানেন। এই পর্বে একটি গূঢ় সন্ধান দেখা দিয়েছে। যে-সব সংকেতের কথা ভাবছেন তার মধ্যে আছে—ঘর-মাঠ, আলোকালো প্রভৃতি সংকেত।

'বাল্মীকি প্রতিভায়' আছে, 'আলো'-কে গ্রহণ করবো কালো এখন থাক' এই উক্তির সঙ্গে ভাবতে হয় 'ভানুসিংহের পদাবলী'র 'কালো'-কে আবাহন। এমনি করে তুটি চিন্তাকে তিনি মিলিয়ে নিচ্ছেন।

এই সম্যক চিন্তার পরিচয় আমরা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা'তেও পাই। তবে সমন্বয় কথাটা আমরা আধুনিককালে এমন ব্যাপকভাবে ব্যবহার করি যে, ওটা বিশেষ অনুধাবন ক'রে দেখতে পাই না। 'তীর্থবাস' কথাটাও এমনি যদৃচ্ছা প্রয়োগে আসল অর্থটি হারিয়ে বসেছে। এসব কথা হৃদয়ানুভূতি থেকে। হৃদয় দিয়েই অনুভব ও অনুসরণ করতে হয়। শান্তিনিকেতনের 'তীর্থবাস' তাই অনেক ব্যক্তির পক্ষে তুচ্ছ 'তীর্থবাস' হয়ে উঠে, ওটা হৃদয়ঙ্গম করেন না। কিন্তু কবি এসব কথা উপলব্ধি করেছেন। তাঁর কাছে এই 'সমন্বয়' বাইরের ব্যাপার নয়। রবীন্দ্রনাথের এসব বিষয়ে গভীর প্রত্যয় ছিল। সেই সংকেতের প্রত্যয় এবং প্রত্যয়ের সংকেত এই পর্ব থেকেই সন্ধান করা যায়। ধ্বনি বা উচ্চারণ রীতিতেও প্রত্যয়ের সেই সংকেত বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠে। এইটিই হচ্ছে রবীন্দ্রকাব্যের বৈশিষ্ট্য।

লেখক হিসেবে তাঁর যেমন প্রত্যয় ছিল তেমনি পাঠক সম্পর্কে তাঁর অনেক সংশয়ও ছিল। 'তুমি কি শুনেছ মোর বাণী'—এই উক্তির মধ্যেও সেই সংশয় দেখা যায়। এই সংশয় ছিল অনেক কারণে। তিনি ছিলেন বিপরীতের সমন্বয়ে বিশ্বাসী। কিন্তু মানুষ খণ্ডকে নিয়ে সেই অন্বয়বোধে পৌঁছতে পারে না। এই অভাব পাঠকদের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেছেন। সেই জন্য তাঁর প্রত্যয় নানা আঙ্গিকে তিনি প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন।

তাঁর কাব্যজীবনের শেষ পর্বে এ বিষয়ে আরও অনেক সংকেত দেখা যায়। 'তদেজতি তন্নৈজতি' প্রভৃতি উপনিষদের অমৃতচিন্তা যে তিনি করে গেছেন তার সংকেত আমরা পাই। বিপরীত চিন্তাকে তিনি

আশ্রয় দেন নি। বরং তিনি বিপরীত চিন্তার বিরোধী। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছেন, মানুষের মধ্যে অন্বয় আছে, অন্বয়বোধ আছে। তবে প্রতিদিনের কর্মে এবং আচরণে সেই অন্বয়ে পৌঁছানোর বাধা আছে। বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'মহাত্মাগান্ধীর' পুস্তিকায় 'প্রবেশক' কবিতাটি (আবৃত্তি করে শুনিয়ে)। এই কবিতায় পাই সেই মানুষের বিপরীত চিন্তার সংকেত। সঙ্গে সঙ্গে কবির প্রত্যয় স্পষ্টভাবে পাই। এই কবিতায় উক্ত 'পূর্বদেশের বৃদ্ধ' যেন পূর্বদেশের বৃদ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত।

প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথের আর একটি কবিতা ('আরোগ্য' গ্রন্থের 'বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে' আবৃত্তি ক'রে শুনিয়ে)। এই কবিতায় আছে সেই 'প্রসন্ন দৃষ্টি'।

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক শিক্ষা-চিন্তা

শ্রীঅমিয় কুমার সেন

আমার আলোচ্য বিষয়, 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক শিক্ষা-চিন্তা রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য কেবল বাংলা ভাষাতেই নয় ইংরাজীতেও প্রকাশ করেছেন। প্রকাশ করেছেন বিদেশীদের বোধগম্য করতে। তিনি নিজে ছিলেন 'স্কুল পালানো' ছেলে। কিন্তু তিনিই পরবর্তীকালে এমন একটি স্কুল স্থাপন করলেন যে সে রকম স্কুল দুবার হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তিনি সে সময়ে ভারতের পুরানো আদর্শ নিয়ে, প্রবন্ধ লিখছিলেন। এই সময়েই তাঁর মনে আসে 'তপোবন' আদর্শ।

একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হলেন—ব্রহ্ম-বিদ্যালয় স্থাপন করবার প্রস্তাব নিয়ে। তিনি অনুমতি দিলেন। ১৯০১ সালে এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তিনি কি দিলেন ?

এখানকার শিক্ষায় বিশেষ জোর ছিল শিক্ষকের উপর। তিনি তিন রকম শিক্ষকের বিষয় বললেন। (১) প্রকৃতি। ইংরাজীতে যাকে Physical aspect বলে তা কিন্তু নয়। আমেরিকায় প্রকৃতি থেকে স্বাস্থ্যের উপর জোর দেয়। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির শিক্ষা mental aspect এর উপর আনলেন। এই বয়সের ছাত্রদের প্রকৃতি-নির্ভর শিক্ষা দরকার। তিনি একথা নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছিলেন। উন্মুক্ত প্রকৃতির সামনে আমরা একদিকে যখন নিজের সঙ্কীর্ণতা সম্পর্কে অবহিত হই, তেমনি এরই মধ্যমে মানুষের সঙ্গে আমাদের যোগ ঘটে। 'তপোবন' প্রবন্ধটি তাই এবিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতির মধ্য দিয়েই আমাদের মানসিক প্রস্তুতি ঘটে।

(২) শিক্ষক নিজে। বর্তমানে আমরা শিক্ষকের মধ্যে পাই শুধু Subject Teacher. এঁরা পণ্ডিত লোক নিঃসন্দেহ। কিন্তু তিনি

ভেবেছিলেন তপোবনের শিক্ষকের কথা। সে শিক্ষক দীপশিখার মতো। দীপ যেমন দীপকে প্রজ্জ্বলিত করে তেমনি এ শিক্ষকের শিক্ষা হবে। এ আদর্শ সমস্ত জীবন পথেরই আদর্শ, শুধু পণ্ডিত্যের নয়।

(৩) আনন্দ। এর মধ্যেও তাঁর এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। Eastern Universities এর বক্তৃতার মধ্যে আছে, কথার মধ্যে আমাদের নানা প্রকাশ আছে, ভাষারও বটে, আর University তে এই মুখের উপরই জোর দিয়েছে বেশি। কিন্তু মানুষ তো কেবল ভাষাজ্ঞানেই আত্মপ্রকাশ করে না। মানুষ রেখা দিয়ে, রঙ দিয়ে, নৃত্য দিয়েও নিজেকে প্রকাশ করে। কিন্তু আমাদের শিক্ষায় সঙ্গীত এসেছে যেন পেছনের দরজা দিয়ে। তিনি চেয়েছিলেন, Educational texture-এই এর স্থান দিতে হবে। শান্তিনিকেতনে তাই এর বিশেষ স্থান।

প্রশ্ন উঠে, শিক্ষকদের একটা ব্যক্তিগত জীবন দর্শন থাকবে কি না। আমি বলব, থাকা উচিত। এবং এই ব্যাপারটি কবি অনেক আগেই চিন্তা করে গেছেন। শিক্ষকের প্রত্যেকটী অভিজ্ঞতার সঙ্গে নূতন নূতন জীবন দর্শন সংযোজিত হয়ে থাকে। আর, ছাত্রদের সঙ্গে অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর জীবনদর্শন রচিত হবে। অনেকটা Everliving stream এর মতো, খনি থেকে আহরণ ক'রে আনা নয়। কবির জীবনেও এই কথা দেখতে পাই। তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, কিন্তু কোন সময়েই বলেন নি এটাই final. কোন doctrine নয়, growth of my lifeই হচ্ছে শান্তিনিকেতন। এই শান্তিনিকেতনে শুধু যে বাইরের চাকচক্যই বদল হয়েছে তা নয়, inner pulp এর ও বদল হয়েছে। স্কুলের শিক্ষকতার মধ্যে division of labour তিনি স্বীকার করেন নি। ও বস্তুটা Factory এর, স্কুলের নয়। তাই তিনি শিক্ষককে Subject Teacher হিসাবে দেখেননি। কারণ, জীবন-ধারণের আদর্শ division of labour theoryতে আনা যায় না।

Human nature সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল to learn and learn evermore. সেইজন্য একটি পরিবেশ তৈরী করতে হবে। আর শান্তিনিকেতনে তিনি সেই পরিবেশ তৈরী করেছিলেন।

শৃঙ্খলা বা discipline সম্পর্কেও তাঁর নিজস্ব মতামত ছিল। শৃঙ্খলাকে তিনি একটা physical condition বলে মনে করতেন না। Discipline is the readiness of the mind to accept. তিনি বলতেন, মানুষের ভ্রূণ এবং নিকৃষ্ট জীবের ভ্রূণের মধ্যে খুব তফাৎ নেই। কিন্তু ঐ স্বল্পকালীন গর্ভবাসের দশ মাসের মধ্যেই মানুষের স্বাতন্ত্র্য ঘটে যায়। মানুষের মধ্যে (শিশুর) এই স্তর অতিক্রম বড় অল্পদিনেই ঘটে যায়। এই যে ক্ষমতা, এই যে স্বতন্ত্র শক্তি এটি অবহেলার নয়। কাজেই এই শক্তির সমগ্র প্রকাশই ঘটতে দিতে হবে।

তিনি শিক্ষায় ready-made method মানতেন না। প্রত্যেক ছেলের বেলায় আলাদা আলাদা method প্রয়োগের পক্ষপাতী তিনি। ওদিকে subject matter উপর তিনি জোর দিতে চাইলেন না। এই জন্যই তিনি subjectwise promotion এর ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা বেশি দিন চল্‌ল না। প্রথম আপত্তি উঠল অভিভাবকদের পক্ষ থেকে। আবার তিনি নিজেও দেখলেন, এই ব্যবস্থায় তিনি অন্য ভাবেই যেন subject matter এর উপর জোর দিচ্ছেন। এরপর কোন্ বিষয়বস্তু ছাত্রকে কতটুকু দিলে তার মন বিকশিত হতে পারে সেই দিকে নজর দিলেন।

কবিগুরুর মতে শিক্ষার কোন বাঁধাধরা লক্ষ্য থাকবে না। যে শিক্ষার লক্ষ্য জীবনে সত্য হয়ে না দাঁড়ায় তার কোনই মূল্য নেই তাঁর কাছে। শিক্ষার লক্ষ্য জীবনে সত্যের রূপ নেবে আর তা মানুষকে আন্তর্জাতিকতা বা বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করবে। এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার লক্ষ্য।

MANIKA PRESS
40, Mahatma Gandhi Road
Calcutta-9